অতীশ দীপঙ্কর

নুরুল ইসলাম মানিক

BanglaBook.org

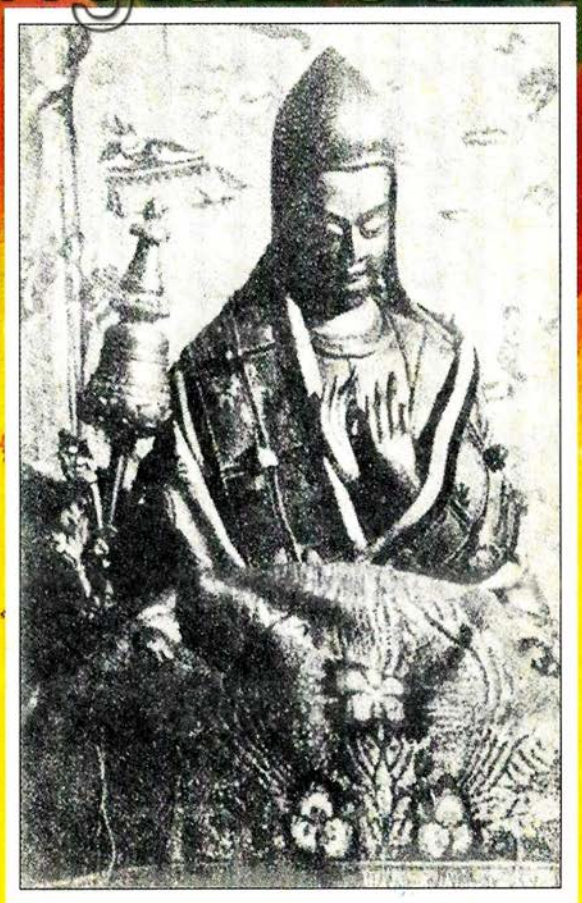

জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ২০০২ উপলক্ষে শত গ্রন্থমালা প্রকাশনা-১৪

অতীশ দীপঙ্কর

নুরুল ইসলাম মানিক

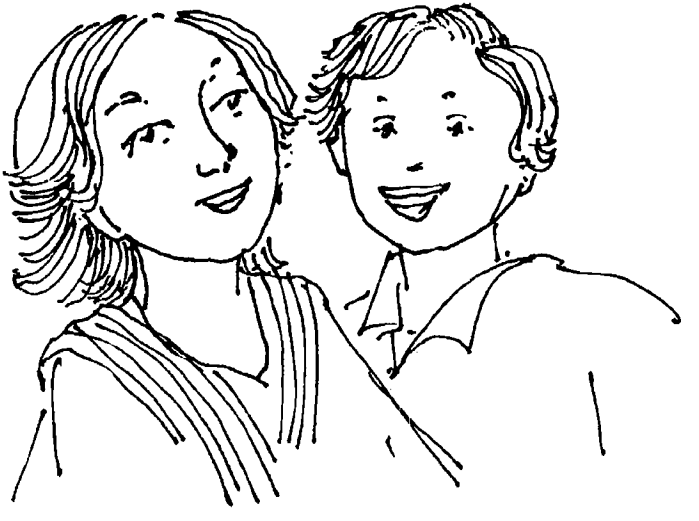

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ শওকাতুজ্জামান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

উৎসর্গ

হৃদয়

ও

তার বন্ধুদের

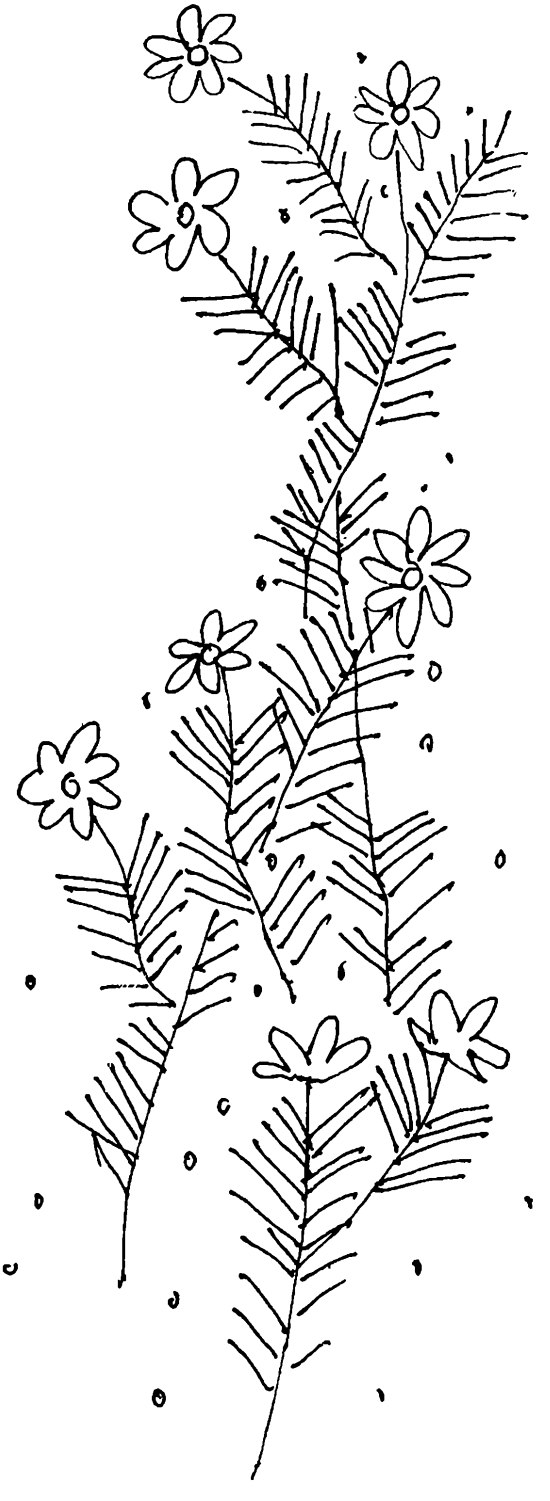

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

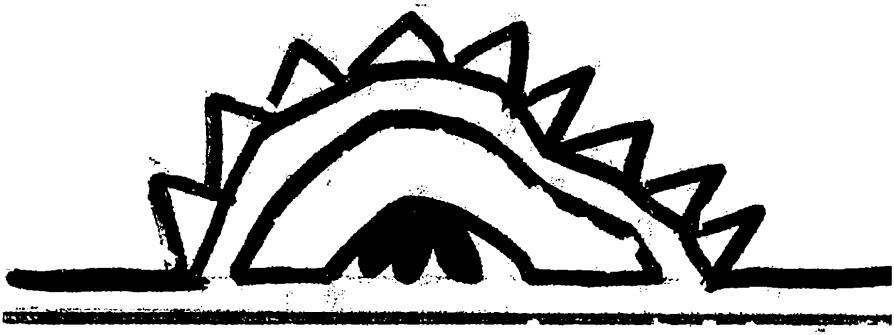

জন্ম

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধকদের একজন। এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সাধকপুরুষ অতীশ দীপঙ্করের জন্ম ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। মতান্তরে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। তার জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। বিক্রমপুর পরগনার সাতাশটি পাড়ার মধ্যে বজ্রযোগিনী অন্যতম। এই বজ্রযোগিনীই অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি।

অতীশ দীপংকরের পিতার নাম কল্যাণশ্রী। মায়ের নাম রানী প্রভাবতী। কল্যাণশ্রী ছিলেন পাল সম্রাটদের একজন সামন্ত রাজা। একজন ন্যায়বিচারক শাসক ছিলেন তিনি। মা প্রভাবতীও ছিলেন একজন পুণ্যময়ী নারী। এক পূর্ণিমা রাতে দীপঙ্করের জন্ম হয়েছিল বলে বাবা-মা তার নাম রেখেছিলে চন্দ্রগর্ভ।

চন্দ্রগর্ভের বিদ্যাশিক্ষার হাতেখড়ি হয় সেকালের একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত জেতারির কাছে। পণ্ডিত জেতারি ছিলেন বরেন্দ্রের অধিবাসী। সেকালে বরেন্দ্র বলা হত বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে। বরেন্দ্র ছিল তখন আলাদা একটি রাজ্য।

খুব অল্প বয়সেই চন্দ্রগর্ভকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহ বরেন্দ্রভূমিতে পাঠানো হয়েছিল। চন্দ্রগর্ভ একুশ বছর ওই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করেন। এ

BanglaBook.org

সময় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের সবগুলো শাখা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। পণ্ডিত জেতারির কাছেই তিনি শিক্ষালাভ করেন ত্রিপিটক, যোগাচার চতুষ্টয়, তেষজ শাস্ত্র, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যা। কথিত আছে, পঁচিশ বছর বয়সে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সাথে দর্শনতত্ত্ব বিষয়ে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি 'মহাপণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে চন্দ্রগর্ভের জ্ঞানপিপাসাও বাড়তে থাকে। একদিন তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, জ্ঞানশিক্ষা করতে হলে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করতে হবে। তাই তিনি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। পিতামাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। তাঁরা চাচ্ছিলেন তাঁদের ছেলে শিক্ষিত হয়ে রাজকার্য হাতে নেবে, সংসারী হবে। কিন্তু হল তার উল্টো। সব বাধা অতিক্রম করে একদিন চন্দ্রগর্ভ বেরিয়ে পড়লেন প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে।

তিনি প্রথমে গেলেন কৃষ্ণগিরির মহাভিক্ষু পণ্ডিত রাহুল গুপ্তের কাছে। এখানে তিনি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হলেন। পণ্ডিত রাহুল গুপ্ত তাঁর শিষ্যের নাম রাখলেন 'গুহ্য-জ্ঞান-বজ্র'। ভিক্ষুধর্মের নানা রহস্য উদ্ঘাটন করে এবার তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন ওদন্তপুরী মহাবিহারে।

পাল সম্রাট দেবপাল এ বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিহারের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। ওদন্তপুরী বিহারের সুনামের কথা শুনে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বিখ্যাত সংঘগুরু শীলরক্ষিতের কাছে। শীলরক্ষিত শিষ্যের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তার নাম রাখলেন 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। এ নামেই তিনি জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অল্পদিনের মধ্যেই গুরুপ্রদত্ত সব জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পাণ্ডিত্যের খবর। তবুও তার মনে তৃপ্তি নেই। জ্ঞানার্জনের পিপাসা তাকে যেন পাগল করে তুলেছে। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি গেলেন মগধে আচার্য ধর্মরক্ষিতের কাছে। উদ্দেশ্য ধ্যানচর্চার মাধ্যমে বৌদ্ধজ্ঞান অর্জন করা। মগধে ধর্মরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে মাত্র কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেন। এ অল্প সময়ের মধ্যে ধর্মরক্ষিতের কাছ থেকে বোধিতত্ত্ব বিষয়ে

BanglaBook.org

অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করেন। ধর্মরক্ষিত তাঁকে ভিক্ষুধর্মের সর্বোচ্চ 'জংগম তীর্থরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

এরপর তিনি ১২৫ জন্য ভিক্ষুকে সাথে নিয়ে নৌপথে দূরপ্রাচ্যের সুবর্ণ দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন সুবর্ণ দ্বীপ বলা হত সুমাত্রাকে। সুবর্ণ দ্বীপ ছিল তখন বৌদ্ধ ধর্মচর্চার এক বিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র। একটানা চৌদ্দ মাস নৌ-ভ্রমণের পর মধ্যসাগর বক্ষে অবস্থিত এ দ্বীপে এসে তারা উপস্থিত হন। সুবর্ণ দ্বীপের মহাচার্য ধর্মপালের শিষ্যত্বে তিনি বৌদ্ধধর্মের দর্শনের জটিল বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এখানে বিদ্যাশিক্ষায় তিনি কাটিয়ে দিলেন জীবনের সুদীর্ঘ বারোটি বছর। ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্ম সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করে গুরুর আদেশে মাতৃভূমি বঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে তিনি কয়েক মাস কাটালেন শ্রীলঙ্কায়। ১০২৩ সালে তিনি ফিরে এলেন বিক্রমশীলায়। দেশে ফেরার পথে মগধের বজ্রাসন বোধি বিহারে তাকে এক গণসংবর্ধনা দিয়ে মহাচার্য ধর্মপাল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর পাল সম্রাট প্রথম মহীপালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্য বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে অতীশ দীপঙ্কর শুধু শিক্ষাদান বা অধ্যাত্ম সাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি, এ সময় তিনি রাষ্ট্রীয় অনেক কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সঙ্কটে তিনি প্রথম মহীপাল ও মহীপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র নয়পালের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টারও দায়িত্ব পালন করেন। দেশে কোনো রাজনৈতিক সঙ্কট ও রাষ্ট্রের জন্য পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হলে অনেক সময়ই সম্রাট প্রথম মহীপাল ও নয়পাল বিক্রমশীলা মহাবিহারে ছুটে আসতেন দীপঙ্করের কাছে।

সম্রাট প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়েই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতরাজ চংছুপের অনুরোধে তিব্বত গমন করেন।

BanglaBook.org

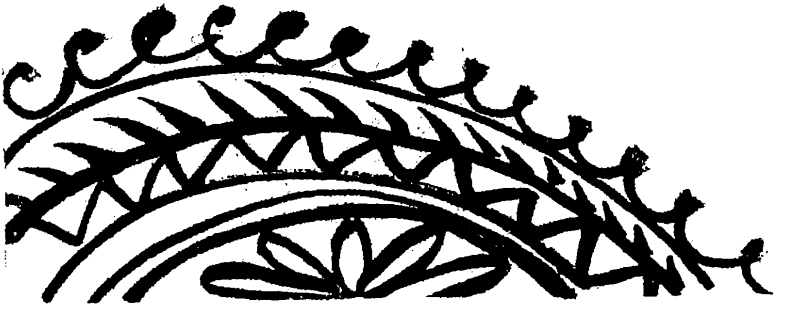

তিব্বতের ডাক

হাজার বছরেরও আগের কথা। হিমালয়ের ওপারে তিব্বত নামের এক দেশ। সেখানে তখন দেখা দিয়েছে দুর্দিন। শিক্ষার আলো নেই। ধর্মের নির্দেশ কেউ মেনে চলে না। গৌতম বুদ্ধের অহিংসার বাণী প্রায় ভুলেই গেছে মানুষ। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর হিংসা হানাহানিতে চারদিক ভরে গেছে। অশান্তি আর অস্বস্তির দেশ হয়ে উঠেছে সমগ্র তিব্বত।

এ সময় তিব্বতের রাজা ছিলেন যেশেও। রাজা যেশেও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তিনি ভাবলেন, গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন তাতে হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানির কোনো স্থান ছিল না। তিনি প্রচার করে গেছেন—'অহিংসাই পরম ধর্ম'। অথচ শিক্ষার অভাবে তিব্বতের মানুষ বুদ্ধের মূল শিক্ষা থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে। হানাহানি, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষে ভরে গেছে দেশ।

রাজা যেশেও ভাবলেন, শিক্ষা ছাড়া এ জাতিকে কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না। এ মুহূর্তে যদি মানুষকে শিক্ষার আলো না দেয়া যায় তবে আর কোনোদিন তার দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। বৌদ্ধ ধর্মের নাম-গন্ধ পর্যন্ত মুছে যাবে তিব্বতের মাটি থেকে। কিন্তু কীভাবে তিনি মানুষকে শিক্ষার আলো দেবেন? এ জন্য উপযুক্ত পণ্ডিত কোথায়?

BanglaBook.org

বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাঁর দেশের একুশ জন যুবককে পাঠালেন কাশ্মীরে পণ্ডিত রত্নবজ্রের কাছে। কারণ তখন কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। আর পণ্ডিত রত্নবজ্র ছিলেন তার মধ্যমণি। রাজা যেশেওর উদ্দেশ্য, ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে যুবকেরা দেশে ফিরে এসে মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করবে।

রাজার আদেশে তুষার পিচ্ছিল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে একুশ জন যুবক কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হলেন। গভীর মনোনিবেশের সাথে তাঁরা অধ্যয়ন করতে লাগলেন বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে। দার্শনিক পণ্ডিত রত্নবজ্রের আন্তরিক চেষ্টায় তাঁরা শিক্ষা শেষ করে স্বদেশের পথে রওয়ানা হলেন।

সবার মনে একই স্বপ্ন, দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে সত্য পথে ফিরিয়ে আনবেন, শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলবেন দেশের মানুষকে। কিন্তু তাদের সে ইচ্ছে পূরণ হল না। স্বদেশের মুখ দেখার আগেই হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি পথে সর্প দংশনে ও অসুস্থ হয়ে উনিশ জন যুবক প্রাণ হারালেন। দেশে ফিরলেন মাত্র দু'জন।

দেশে ফিরে তারা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদন করলেন রাজা যেশেওর কাছে। যেশেও তাদের কথা শুনে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিলেন। এখন কী উপায়, কীভাবে তিনি দেশের মানুষকে শিক্ষিত করবেন? তার হাতে এমন কোনো অর্থ নেই যা দিয়ে বার বার তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠাবেন বিদেশে জ্ঞান শিক্ষার জন্য! আর এ জন্য তো অনেক সময়ের প্রয়োজন। ততদিনের মানুষ কুশিক্ষার আঁধারে হারিয়ে যাবে!

রাজা যেশেও যখন কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তখন কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা দু'জন শিক্ষার্থীই তাকে পথ দেখালেন। বললেন, মহারাজ, আমরা শুনেছি বিক্রমশীলা মহাবিহারে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে একজন পণ্ডিত আছেন। তাঁকে তিব্বতে আনতে পারলে আপনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সার্থক হবে। বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর মতো এমন পণ্ডিত ও প্রজ্ঞাবান মানুষ বর্তমানে পৃথবীতে আর একজনও নেই। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ!

BanglaBook.org

শিক্ষার্থীদের মুখে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে রাজা যেশেওর মন গভীর শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করেই হোক এই মহাজ্ঞানীকে তিব্বতে আনতেই হবে। তাঁকে দিয়েই তিব্বতের মানুষের ঘরে ঘরে আবার শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে।

দীপঙ্করের খোঁজে

বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনতে হবে। রাজা যেশেও রাজকোষ উজাড় করে দিলেন। কিন্তু রাজকোষে যা অর্থ আছে তা যথেষ্ট নয়। এজন্য আরো অর্থের প্রয়োজন। চাই আরো স্বর্ণ, মণি-মুক্তা, হীরে-জহরত। যে করেই হোক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনতে হবে। যেশেও পার্শ্ববর্তী মিত্র রাজাদের কাছ থেকেও ধার করলেন অনেক অর্থ।

অবশেষে বিক্রমশীলা মহাবিহারে যাওয়ার জন্য এক শ' উৎসাহী বলিষ্ঠ যুবককে ঠিক করলেন। যাত্রীদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও নিয়োগ করলেন। পথের খরচ ছাড়াও মহাজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য কয়েক বাক্স স্বর্ণমুদ্রা, মণি-মুক্তা, হীরে-জহরত বোঝাই করে দেয়া হল

শত মানুষের এক কাফেলা যাত্রা করল তিব্বত থেকে বাংলার পথে, বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের

BanglaBook.org

উদ্দেশ্যে। দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে একদিন কাফেলা এসে পৌঁছল বিক্রমশীলা মহাবিহারে। পথে অনেকেই প্রাণ হারাল। যারা বেঁচে রইলেন তারাও ক্লান্ত, অবসন্ন। তাই কিছুদিন বিক্রমশীলা মহাবিহারের অতিথিশালায় বিশ্রাম নিলেন। তারপর একদিন তারা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন।

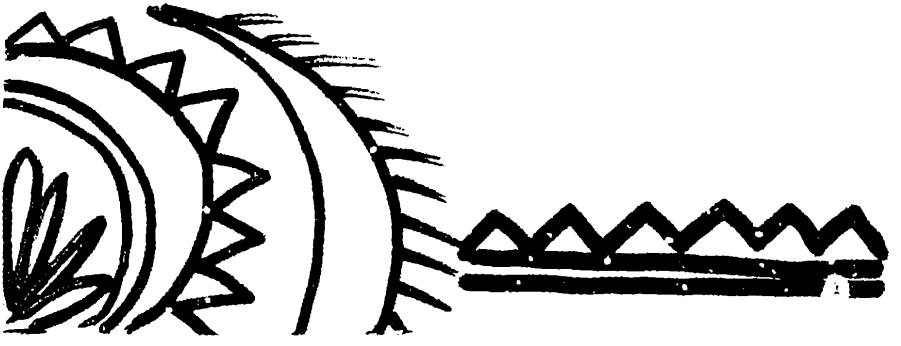

দীপঙ্করের মুখোমুখি

তিব্বতিরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। প্রথমেই তারা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে 'অতীশ' বলে সম্বোধন করে বিনীতভাবে প্রণাম জানালেন। তিব্বতি ভাষায় অতীশ মানে 'মহামানব'।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দূরদেশ থেকে কেন এসেছ তোমরা?'

তারা যেন কোনো উত্তরই দিতে পারলেন না। শুধু একটি বাক্স খুলে তাদের রাজার পক্ষ থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা নিবেদন করলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে। অন্য বাক্সগুলো দেখিয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'আমাদের মহারাজ যেশেও পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর কাছে এ উপহারগুলো পাঠিয়েছেন। আপনি এগুলো গ্রহণ করে আমাদের মহারাজকে কৃতার্থ করুন।'

BanglaBook.org

দীপঙ্কর শুধু একপলক তাকালেন আগন্তুকদের প্রতি। তারপর অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। তারা বুঝতে পারলেন, হয়তো কোথাও ভুল হয়ে গেছে, তাদের এ উপঢৌকনের প্রতি অতীশের কোনো আকর্ষণই নেই।

হতাশায় তাদের চোখে যেন আঁধার ঘনিয়ে এল। দলপতি সঙ্কোচের সাথে একটি রাজকীয় পত্র তুলে দিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রতি। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজা যেশেওর পত্রটি খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করলেন। তারপর কী যেন এক চিন্তায় মগ্ন হলেন। মনে মনে বললেন, 'এ পত্রেও প্রলোভন! প্রকৃত মানুষ কি লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে? ধন-সম্পদ তো কাউকে চিরসুখী করতে পারে না। যার সম্পদ বেশি, সে আরো সম্পদ পাওয়ার আশায় পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু তাতেও তার তৃপ্তি নেই। যে ধন-সম্পদে তৃপ্তি নেই, তার জন্যই মানুষ পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়। অবশেষে একদিন পাপের বোঝা বাড়িয়ে সেই ধন-সম্পদ ফেলে তাকে চলে যেতে হয়। তবে কী লাভ ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করে? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভাবেন, আমারও ধন-সম্পদের অভাব ছিল না। ছিলাম রাজপুত্র, সম্পদের মোহ ত্যাগ করেই তো জ্ঞানের সন্ধানে পথে বেরিয়েছি।'

সহসাই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতিদের বললেন, 'তোমরা দু'টি কারণে আমাকে তিব্বতে নিতে চাচ্ছ। প্রথমত স্বর্ণমুদ্রা, হীরে-জহরত ও মণি-মুক্তার লোভ। দ্বিতীয়ত তিব্বতে গেলে মানুষ আমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করবে। কিন্তু এর একটির প্রতিও আমার লোভ নেই। তাই আমার তিব্বতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

অনেক চেষ্টা করেও তিব্বতিরা ব্যর্থ হলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতের যখন কোনো পরিবর্তনই করা গেল না তখন তারা কান্না শুরু করলেন। এত অর্থ ক্ষয় ও পথ-কষ্টের পরেও তাদের সাধ পূর্ণ হল না। দেশে গিয়ে তারা রাজাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবেন!

অবশেষে হতাশায় ভারাক্রান্ত মনে তারা স্বদেশের পথে রওয়ানা হলেন।

BanglaBook.org

রাজা যেশেওর অন্তিম ইচ্ছে

মহারাজ যেশেও যখন শুনলেন যারা বাংলায় গিয়েছিল মহাজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে আনতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। যে একশ' জন লোক গিয়েছিল তাদের অর্ধেকেরও বেশি দুর্গম পথ পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন হারিয়েছে এবং শুধু তা-ই নয়, যে সম্পদ তারা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল তাও লুণ্ঠিত হয়েছে দস্যুদের হাতে—তখন মহারাজ যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

দূতদের কাছে যখন শুনলেন, এ উপঢৌকনগুলোই কাল হয়েছে। যদি এগুলোকে মহাজ্ঞানী অতীশ প্রলোভন না ভাবতেন তবে হয়তো তিনি তিব্বতে আসতেন। যেশেও ভাবলেন, 'না, এ মহামানবের কাছে সম্পদ উপহার পাঠানো ঠিক হয় নি। এটা মহা ভুল হয়ে গেছে। অতীশকে যে করেই হোক তিব্বতে আনতেই হবে। প্রয়োজনে আবার লোক পাঠানো হবে। তবে এবার কোনো উপহার-উপঢৌকন নয়। এবার শুধু তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের দুর্দশার কথা জানিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা হবে। তবে নিশ্চয়ই তিনি তিব্বতবাসীর অনুরোধ ফেরাতে পারবেন না।'

কিন্তু কীভাবে তিনি লোকজনকে আবার বাংলায় পাঠাবেন? তাদের পাঠাতে হলেও তো প্রচুর অর্থের দরকার। এদিকে রাজকোষ শূন্য। মহারাজ যেশেও যেন চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। যত ত্যাগ স্বীকার করেই হোক বাংলার পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনতেই হবে। এজন্য যদি তার প্রাণ যায় তবুও তিব্বতের মাটিতে এ মহাজ্ঞানীকে আনবেন।

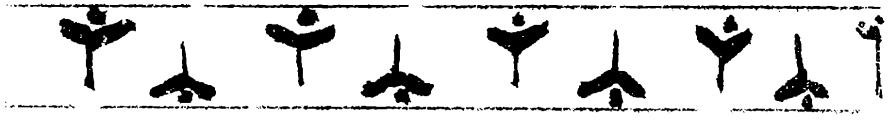

BanglaBook.org

রাজা যেশেও অর্থ সংগ্রহের আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে সীমান্ত রাজ্য গারোয়াল আক্রমণ করে বসলেন। শিক্ষা বিস্তারের কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য পররাজ্য আক্রমণ, ইতিহাসে এমন ঘটনার কথা আর শোনা যায় না। একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে দেশে আনার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথাও মানুষ আগে আর কোনোদিন শোনে নি। অথচ রাজা যেশেও তাই করলেন। কিন্তু মহারাজার এ ইচ্ছেও পূর্ণ হল না। যুদ্ধে তিনি বন্দি হলেন।

এরপর তিব্বতের রাজা হলেন যেশেওর পুত্র চংছুপ। পিতাকে উদ্ধারের জন্য একদিন তিনি দেখা করলেন গারোয়াল রাজের সাথে। চংছুপ বললেন, 'আমার বৃদ্ধ পিতা দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহের আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে আপনার দেশ আক্রমণ করেছেন। যদিও আমার পিতার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তবু তিনি প্রতিবেশী দেশ আক্রমণ করে মহা অন্যায় করেছেন। আমি এজন্য গারোয়াল মহারাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আপনি দয়া করে আমার মহান বৃদ্ধ পিতাকে মুক্তি দিন।'

অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর যুবরাজ চংছুপ গারোয়াল রাজের সাথে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী পিতার মুক্তির জন্য গারোয়াল রাজকে প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। যুবরাজ প্রায় এক বছর চেষ্টা করে সন্ধির শর্তানুযায়ী অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করলেন। তার বুকে আশা, এ অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তিনি পিতাকে গারোয়াল রাজের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনবেন। প্রথমেই তিনি অর্থ সংগ্রহের আনন্দ সংবাদ নিয়ে ছুটে গেলেন কারাগারে বন্দি পিতা যেশেওর কাছে। পিতাকে গিয়ে বললেন, 'হে আমার মহান পিতা, আপনার মুক্তির সময় হয়েছে। মুক্তিপণের সব অর্থ যোগাড় করা হয়ে গেছে। আপনাকে আমরা ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

রাজা যেশেও যুবরাজ চংছুপের কাছে শুনলেন তার মুক্তির বিনিময়ে গারোয়াল রাজকে কি পরিমাণ অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে।

পুত্র তার পিতার জন্য এত অর্থ সংগ্রহ করেছে শুনে বিস্মিত হলেন রাজা যেশেও। পুত্রকে স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি এ বৃদ্ধ পিতার জন্য যা করেছ তার কোনো তুলনা হয় না। আমি জানি এ অর্থ সংগ্রহ করতে তোমাকে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এজন্য আমি

BanglaBook.org

তোমার মঙ্গল কামনা করি। কিন্তু সেই সাথে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি এ অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে যাও। আমার মুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই।'

যুবরাজ চংছুপ পিতার মুখে এ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, 'পিতা, আমার কি কোনো অপরাধ হয়েছে?' যেশেও বললেন, 'না পুত্র, তুমি যা করেছ ইতিহাসে চিরদিন তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। তবে তুমি জানো, আমার বয়স হয়েছে, আমার বড় জোর দশ কি পনেরো বছর আয়ু আছে। কাজেই এ অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা খরচ করে আমাকে মুক্ত করে কোনো লাভ নেই। তুমি বরং এ অর্থ দিয়ে বাংলার অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে আনার চেষ্টা করো। তিনি এলে আমার দেশের মানুষ অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে। রাজা যেশেও যুবরাজকে আরো পরামর্শ দিলেন, অতীশকে দূত মারফত আমার অন্তিম ইচ্ছের কথা জানিও। এতে হয়তো মহাজ্ঞানী অতীশের মনে কোনো পরিবর্তনও আসতে পারে। আর তিনি যদি একান্তই আসতে না চান তবে বাংলা থেকে তার পরের কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে আনার চেষ্টা করো।'

অনেক অনুনয়-বিনয় করেও মহারাজ যেশেওকে রাজি করাতে পারলেন না যুবরাজ চুংছুপ। হায় পিতা! শিক্ষার জন্য আপনি এভাবে স্বেচ্ছায় বন্দিজীবন বেছে নিলেন! যুবরাজ চংছুপ যতই ভাবেন ততই তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

পিতা যেশেও নিজ হাতে পুত্রের চোখের পানি মুছে দিলেন। এরপর কপালে চুমু দিয়ে বললেন, 'যাও আমার প্রিয় পুত্র! আমার জন্য কোনো দুঃখ করো না। দেশের মানুষ যদি শিক্ষিত হয় তবেই আমার আত্মা শান্তিতে থাকবে।'

যুবরাজ চংছুপ দেশে ফিরে এলেন। শেষ পর্যন্ত মহারাজ যেশেওর স্বপ্নও বাস্তব হল। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে এলেন। কিন্তু ততদিনে যেশেও বেঁচে নেই। মহাজ্ঞানী অতীশের কথা ভাবতে ভাবতেই কারাগারে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

BanglaBook.org

রাজা চংছুপের দূত

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে যিনি তিব্বতে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি আচার্য বিনয় ধর। আচার্য বিনয় ধর তার নাম নয়, নামের বাংলা অর্থ। তিব্বতি ভাষায় তার নাম 'টষল-খ্রিম-গ্যালবা'। তবে বাংলার ইতিহাসে তিনি আচার্য বিনয় ধর নামেই পরিচিত হয়ে আছেন অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যাবার কৃতিত্বের জন্য। আচার্য বিনয় ধর বিক্রমশীলা বিহারে আসার আগে আরো দু'বার ভারতে এসেছিলেন। কাজেই ভারতের পথঘাট, জলবায়ু ও ভাষা সম্বন্ধে তার অনেক অভিজ্ঞতা ছিল।

যুবরাজ চংছুপ তখন দেশের রাজা। তার মনে একই চিন্তা, কী করে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে আনবেন। পিতার অন্তিম ইচ্ছাকে কীভাবে পূরণ করবেন তিনি।

একদিন তিনি বিনয় ধরকে ডেকে বললেন, 'হে আচার্য! আপনি তো আরো দু'বার ভারতবর্ষে গিয়েছেন। দুর্গম হিমালয়ের বাধা অতিক্রম করে কীভাবে সে দেশে যেতে হয় সে সম্বন্ধে আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। আপনি যদি বিক্রমশীলা মহাবিহারে যান তবে হয়তো মহাজ্ঞানী অতীশকে আমাদের দেশে আনা সম্ভব হবে। আমার পিতার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনার কাছে আমি দয়া প্রার্থনা করি।' আচার্য বিনয় ধর রাজার আদেশকে শিরোধার্য মেনে তৈরি হলেন মগধের বিক্রমশীলা মহাবিহারের উদ্দেশে যাত্রার জন্য।

BanglaBook.org

বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাল সম্রাট ধর্মপাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি এ বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম বা উপাধি ছিল বিক্রমশীল। তাঁর নাম বা উপাধি অনুসারেই বিহারটির নামকরণ করা হয় বিক্রমশীলা মহাবিহার। সে যুগে নালন্দা, ওদন্তপুরী, সোমপুর ও বিক্রমশীলা মহাবিহার ছিল জ্ঞানচর্চায় সারা বিশ্বে খ্যাত। তবে নালন্দা প্রাচীন হওয়ায় চীনা পর্যটকদের বিবরণীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশি উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারকানাথের বিবরণ থেকে জানা যায় সে যুগে বিক্রমশীলা মহাবিহারই ছিল সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। অতীশ দীপঙ্করের সময় এ বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিহারের খ্যাতি নালন্দাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এ বিশ্ববিদ্যালয়টি কোথায় অবস্থিত ছিল এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে নানা মতবিরোধ ছিল। অনেকেই মনে করতেন এটি ছিল মগধে। প্রাচীনকালে বিহার অঞ্চলকে বলা হত মগধ। পরে বর্তমানে নিশ্চিত করে জানা গেছে যে, বিদেশীদের কাছে এ বিহারটি মগধের বিক্রমশীলা বিহার নামে পরিচিত হলেও আসলে এটি অবস্থিত ছিল বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরে। স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এটি যদি সত্যি সত্যি বিক্রমপুরেই অবস্থিত হবে তবে মিছেমিছি একে মগধের বিক্রমশীলা মহাবিহার বলা হত কেন? এরও কারণ আছে। সে সময় সমগ্র মগধ ছিল বাংলার অধীনে। আর পাল সম্রাটদের রাজধানী ছিল মগধের পাটলিপুত্রে। রাজারা যেহেতু মগধে থাকেন তাই বিদেশীরা বঙ্গদেশ বলতে মগধই বুঝতেন। তাছাড়া সে যুগে এদেশের নাম বাংলা বা বঙ্গদেশ নামেও পরিচিত হয়ে ওঠে নি।

যাক সে কথা। আচার্য বিনয় ধর যখন বাংলায় আসেন তখন পাল বংশের রাজা নয়পাল এদেশের শাসনক্ষমতায়। নয়পালের পিতা প্রথম মহীপাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে জ্ঞানচর্চার অন্যতম পাদপীঠ এ বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো জ্ঞানীর সংস্পর্শে এসে বিশ্বদ্যিালয়টির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। অষ্টাদশ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এ বিহার বৌদ্ধজগতে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে। বাংলার জলবায়ুর কারণে একদিন কালের গর্ভে এ মহাবিহারটি হারিয়ে গেলেও বাঙালির জ্ঞানচর্চার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায় নি।

BanglaBook.org

বিক্রমশীলা মহাবিহার

আচার্য বিনয় ধর যুবরাজ চংছুপের অনুরোধে ছয় মাস আগে যাত্রা শুরু করেছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের উদ্দেশ্যে। নেপালের পথ ধরে কয়েক মাস পথ হাঁটার পর তারা এসে উপস্থিত হলেন মগধ রাজ্যে। রাজধানী থেকে পরের দিনই রওয়ানা হলেন বঙ্গের বিক্রমশীলা মহাবিহারের পথে। কয়েক দিন পথ হাঁটার পর এক বিকেলে বালুকা নামক এক বিশাল নদীর তীরে উপস্থিত হলেন তারা। আজ আমাদের দেশে এই নদীটির কোনো অস্তিত্বও নেই।

তিব্বত থেকে আগত পরিব্রাজকেরা দেখলেন নদীর ওপারে বিক্রমশীলা মহাবিহারের সুউচ্চ চূড়ায় গোধূলির আলো ছিটকে পড়ছে। আনন্দে তাদের মন ভরে উঠল। তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। তারা খেয়াঘাটে এসে দেখলেন যাত্রীতে নৌকা বোঝাই। বেলা থাকতে তারা নৌকায় উঠতে পারলেন না।

যাবার সময় মাঝি কথা দিয়ে গেছে যাত্রী নামিয়ে আবার এসে তাদের নিয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও নৌকা ফিরে এল না। হতাশায় তাদের মন ছেয়ে গেল। দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়ে এল। এত রাতে মাঝি আর ফিরে আসবে না মনে করে তারা নদীর তীরেই তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করলেন। নদীর এপারে যতদূর চোখ যায় কোনো জনবসতি নেই। চারদিকে ধানক্ষেত আর ছোট ছোট গাছপালা। শ্যামল শোভায় ভরা প্রকৃতি।

BanglaBook.org

রাতের ভরা পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোয় প্রকৃতির বুকে যেন পুলক লেগেছে। একদিকে মৃদু-মন্দ হাওয়া অন্যদিকে নদীর বুকে জ্যোৎস্নার আলো, আরেকদিকে জগৎবিখ্যাত বিক্রমশীলা মহাবিহার দেখতে পাওয়ার আনন্দ তাদের মনকে যেন উতলা করে তুলেছে।

অভিযাত্রীদল তাদের সাথের অর্থ-সম্পদ বালির নিচে লুকিয়ে রাখার যেই উদ্যোগ নিলেন অমনি বালুকা নদীর বুকে দেখা গেল ক্ষীণ এক দীপশিখা। তাদের বুঝতে আর দেরি হল না, মাঝি তাদের কথামতো নৌকা নিয়ে ফিরে আসছেন।

জ্যোৎস্নার আলোয় নদীর তরঙ্গে ভাসমান নৌকার ক্ষীণ দীপশিখাটি দেখে মনে হচ্ছে যেন সুদূর আকাশের বুকে ফুটে থাকা ধ্রুবতারা—যে তারার আলো দেখে অভিযাত্রীরা যুগ যুগ ধরে পথ চলেছেন।

একটু পরেই নৌকা ঘাটে এসে ভিড়ল। অভিযাত্রীরা তাদের নিতে ফিরে আসায় নৌকার মাঝিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন।

মাঝিও তাদের ধন্যবাদের জবাবে বললেন, 'আপনারা ভোটদেশ থেকে এত দূরে এসেছেন, এত রাতে আপনাদের অপেক্ষা করতে বলে ঘরে ফিরব কীভাবে!' তখন ভোটদেশ বলা হত তিব্বতকে। মাঝি আরো বললেন, আমাদের রাজার আদেশ, কাউকে খেয়াঘাটে বসিয়ে রেখে যেন খেয়া পারাপার বন্ধ করা না হয়।

'আজকাল রাজ্যের যুদ্ধবাজ রাজা লক্ষ্মীকর্ণের ভীষণ উৎপাত বেড়ে গেছে। তারা রাতের অন্ধকারে কখন যে কার উপর চড়াও হয়ে বসে এর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তাই মহারাজ নয়পালের নির্দেশে, কাউকে নদীর ওপারে রেখে যেন খেয়া বন্ধ করা না হয়।'

তিব্বতি পর্যটকেরা এদেশে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলেন পাল রাজাদের দিনকাল এখন আর আগের মতো যাচ্ছে না। এরই মধ্যে একবার নয়পাল লক্ষ্মীকর্ণের সাথে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের রাজধানী দখল করতে পারে নি। যাক, নৌকা যখন এসে গেছে তখন আর বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই।

তিব্বতিরা দ্রুত তাদের মালামাল নিয়ে নৌকায় উঠলেন। নদীর ওপারে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অপরূপ দৃশ্য আর জ্যোৎস্নাস্নাত নদীর ঢেউয়ের

BanglaBook.org

দোলায় তাদের মন-প্রাণ যেন অজানা এক শিহরণে কাঁপতে লাগল। সুনীল আকাশে লক্ষ লক্ষ তারার প্রদীপ আর বিক্রমশীলা বিহারের ক্ষীণ আলোর শিখাগুলো যেন একাকার হয়ে গেছে। আজ তারা অতীশ দীপঙ্করকে দেখতে পাবে, এ আনন্দ যেন আর ধরে রাখা যায় না।

গভীর রাত। বিহার বা বিদ্যাপীঠের প্রবেশদ্বারগুলো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। শিক্ষার্থীরা তাদের কুঠুরিতে বসে জ্ঞানচর্চায় মগ্ন। সেসব জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থীর কুঠুরির আলো ছিটকে পড়ছে বাইরের পৃথিবীতে।

নিরুপায় হয়ে তোরণের বাইরে অতিথিশালায় তারা রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাদের ভাগ্য ভালো। অতিথিশালার পাশেই এক পাঠকক্ষে তিব্বতি এক ছাত্র বাস করতেন। নিজের দেশের মানুষের ভাষা শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন তারা তিব্বত থেকে এসেছেন। এ ছাত্রের নাম গচোনসেং। তিনি স্বদেশ থেকে আসা লোকদের সাথে কথা বলে তাদের এ দূরদেশে আসার উদ্দেশ্য জানতে পারলেন।

গচোনসেং তাদের পরামর্শ দিলেন, 'সাবধান কিছুতেই তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করো না। যদি এখানকার লোকজন তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারে, তবে কিছুতেই তারা তোমাদের মহাজ্ঞানী অতীশের সাথে দেখা করতে দেবে না।' গচোনসেং-এর পরামর্শ মতো তারা শিক্ষার্থী হিসেবে বিক্রমশীলা মহাবিহারে ভর্তি হলেন। তাদেরকে বিহার প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল।

কয়েক দিন পর সময় বুঝে আচার্য বিনয় ধর অধ্যাপক রত্নাকর কান্তির কাছে তাদের বাংলায় আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বললেন। তিনি তিব্বতের মহারাজ যেশেও বিদেশের মাটিতে বন্দি থেকে মৃত্যুবরণ ও তার অন্তিম ইচ্ছের কথাও অধ্যাপক রত্নাকর কান্তির কাছে জানালেন। জ্ঞানের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল রাজার মহত্ত্বের কথা শুনে তিনি বিনয় ধরকে বললেন, 'আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কাছে তোমাদের সব কাহিনীই খুলে বলব। হয়তো তিনি তিব্বতে যেতে রাজি হতেও পারেন। আর যদি একান্তই রাজি না হন, তবে যাতে তিনি অন্য কাউকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন সে অনুরোধও তাঁকে জানাব।'

BanglaBook.org

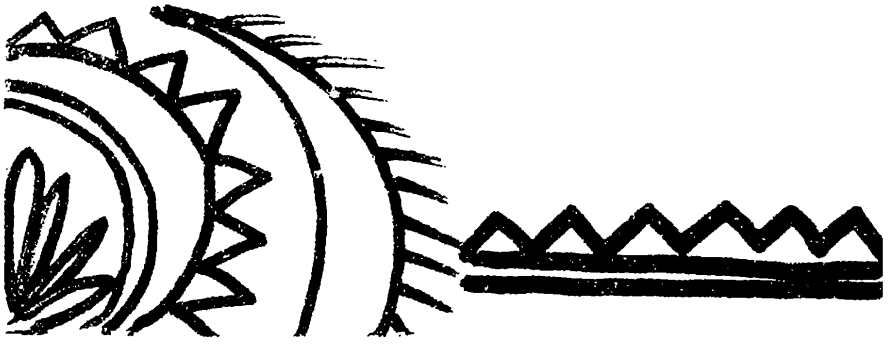

চিন্তামগ্ন দীপঙ্কর

বিক্রমশীলা বিহার এক বিস্মৃত জায়গায় অবস্থিত। এ মহাবিহারেই বাস করেন ১১৪ জন আচার্য। বিহারের বাইরে বাস করেন ১০৮ জন আচার্য। তারপরেও আছেন মহাবিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সব মিলিয়ে ৩২৩ জন পণ্ডিত প্রতিদিন মহাবিহারের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন।

শুধু বৌদ্ধশাস্ত্রেই নয়, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, বিজ্ঞান সব বিষয়েই এখানে শিক্ষা দেয়া হয়। আর এসব প্রাচ্যবিদ্যা সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী হচ্ছেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি যে কোনো ছাত্রের সাথে, যে কোনো আচার্যের সাথে যে কোনো বিষয়ে সবসময়ই খোলামেলা আলোচনা করতে প্রস্তুত। সম্রাট মহীপাল যখন এ বিহার পরিদর্শনে আসতেন তখন তিনিও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অনুমতি ছাড়া আসন গ্রহণ করতেন না। মহীপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র নয়পালও অতীশ দীপঙ্করকে তেমনি শ্রদ্ধা করেন।

একদিন বিকেলে বিহারের ছাদে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নয়পালের কথাই ভাবছিলেন। নয়পাল বিদ্যানুরাগী হলেও পিতার মতো দিগ্বিজয়ী বীর ও বিচক্ষণ নন। যে মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করে বাংলার সীমানা সুদূর বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন সেই মহীপালের সন্তান নয়পালের আমলেই

BanglaBook.org

প্রতিবেশী রাজার সাথে যুদ্ধ করে পরাজয় মেনে নিচ্ছেন। হয়তো পাল রাজত্ব আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন এসব চিন্তায় মগ্ন তখন আচার্য রত্নাকর কান্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে ছাদে উঠে এলেন। আচার্য রত্নাকর বয়সে দীপঙ্করের চেয়ে বড়। দীপঙ্কর তাকে খুব মান্য করেন।

রত্নাকর কান্তিকে দেখে দীপঙ্করের চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জানেন খুব জরুরি প্রয়োজন না থাকলে এ বয়সে রত্নাকর কান্তির ছাদে উঠে আসার কথা নয়। নিশ্চয়ই তার সাথে আচার্য রত্নাকরের কোনো জরুরি কথা আছে। দীপঙ্কর লজ্জিতভাবে বললেন, 'আচার্যজী আমাকে খবর দিলেই তো পারতেন, আমি গিয়ে আপনার সাথে দেখা করতাম।' আচার্য রত্নাকর অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা না বলে সরাসরিই বললেন, 'চন্দ্রগর্ভ, তিব্বতিরা আজ এক সপ্তাহেরও বেশি সময় হল এসেছে। তারা তোমার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।'

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতিদের দেখেই বুঝতে পারছিলেন এরা নিশ্চয়ই একই উদ্দেশ্যে এসেছে। তবু তিনি ইচ্ছে করেই তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এবার আচার্য রত্নাকরের কথার উত্তর না দিয়ে পারলেন না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ওরা আবার কেন এসেছে, আমি গতবারও ওদের না বলে দিয়েছি। দেশের মাটি ছেড়ে আমি আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সে দেশে যাব না।'রত্নাকর বললেন, 'না, চন্দ্রগর্ভ, ওরা আমাকে যা বলেছে তুমি নিজের কানেই ওদের কাছ থেকে শোনো, কি বলতে চায় ওরা।'

চন্দ্রগর্ভ, অতীশ দীপঙ্করের বাল্যনাম। বয়সে বড় বলে আচার্য রত্নাকর দীপঙ্করকে এ নামেই সম্বোধন করেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চন্দ্রগর্ভ বললেন, 'দেশ এখন শত্রু পরিবেষ্টিত, কর্ণাটকের সেনরা সুযোগ খুঁজছে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ জিইয়ে রাখছে। লক্ষ্মীকর্ণ যেভাবে নয়, পালের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে তা যদি বন্ধ না করা যায়, তবে পাল রাজত্ব অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুযোগ বুঝে সেনরা চড়াও হয়ে বসবে এদেশের ওপর। দেশে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি কী করে তিব্বতে যাব?'

রত্নাকর বললেন, 'সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু তিব্বতিদের সাথে দেখা করতে তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।'

BanglaBook.org

দীপঙ্কর বললেন, 'আপনি ওদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাদের সাথে আলাপ করে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেব।'

দীপঙ্করের সম্মতিলাভ

সেদিন রাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে তিব্বতিদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। আচার্য বিনয় ধর তার সঙ্গীদের নিয়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অতীশ দীপঙ্করের সাথে দেখা করলেন। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আচার্য বিনয় ধর প্রথমে বললেন, 'হে জ্ঞানতাপস! আপনাকে বার বার বিরক্ত করা ঠিক নয় জেনেও আমাদের আবার আপনার কাছে আসতে হয়েছে। তিব্বতে এখন মহাদুর্দিন চলছে। মানুষ ধর্মের পথ ছেড়ে অধর্মের পিছে ছুটে চলেছে। সঠিক শিক্ষার অভাবে সমাজে দেখা দিয়েছে নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি। এ অবস্থা থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশে এমন একজন শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন যিনি শুধু ধর্মশাস্ত্রেই শ্রেষ্ঠ নন, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন ব্যবস্থাকেও যিনি দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। একবাক্যে দেশের মানুষ যাকে ত্রাণকর্তা বলে মেনে নেবে। আমাদের বিশ্বাস আপনি তিব্বতে গেলে দেশের মানুষ আপনার সংস্পর্শে এসে আবার ঐক্যবদ্ধ হবে, জ্ঞান ও শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাদের অন্তর্লোক।'

এরপর আচার্য বিনয় ধর দেশের শিক্ষার জন্য রাজা যেশেওর আত্মত্যাগের কাহিনীও বললেন। বললেন, কীভাবে তিনি তাঁকে তিব্বতে নেয়ার জন্য বিদেশের কারাগারে বন্দিদশায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রাজা যেশেওর মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী শুনে অতীশের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'জগতে এই ত্যাগের তুলনা নেই। তোমাদের কথা শুনে আমার মন চাইছে রাজা যেশেওর অন্তিম ইচ্ছে পূরণ করতে। কিন্তু আমার উপর এই মহাবিহারের গুরুদায়িত্ব। এসব কাজ গুছিয়ে যেতে আমার অন্তত আঠার মাস সময়ের প্রয়োজন। এতদিন তোমাদের এদেশে অবস্থান করা কি ঠিক হবে?'

দীপঙ্করের কাছে এ আশ্বাস বাণী শুনে আচার্য বিনয় ধর যেন আশার আলো দেখলেন। বললেন, 'আপনার জন্য আমরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে পারি। এ আঠার মাস সময় তো আমাদের কাছে তেমন কিছুই না।'

BanglaBook.org

আক্রান্ত স্বদেশ

দীর্ঘদিন ধরে চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সাথে নয়পালের যুদ্ধ চলছে। এক সময় পাল রাজত্ব বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে পাঞ্জাব ও বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও বর্তমানে এ সাম্রাজ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসামের কামরূপ পর্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে।

পাল রাজারা তাদের রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজধানী কখনো এক জায়গায় স্থায়ী রাখতেন না। কখনো মগধে, কখনো বিক্রমশীলা, কখনো বা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করতেন। নয়পালের সময় রাজ্য সংকুচিত হয়ে আসলেও পূর্বপুরুষদের নীতি অনুযায়ী তিনিও কখনো মগধের পাটলিপুত্রে কখনো বা বিক্রমশীলায় বসে রাজ্য পরিচালনা করেন।

চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের বিরুদ্ধে কৌশল হিসেবে নয়পাল তার রাজধানী বিক্রমশীলায় স্থানান্তরের কাজে ব্যস্ত। এ সংবাদ গুপ্তচর মারফত পাওয়ার সাথে সাথেই লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালকে যাত্রাপথে আক্রমণ করে বসল।

নয়পালের বিশাল নৌবহর চম্পা নদীর বুকে ভেসে চলেছে। সাথে দু'হাজার সৈন্য। পুত্র বিগ্রহপালও রয়েছেন নয়পালের সাথে। এমন সময় রাতের অন্ধকারে লক্ষ্মীকর্ণ দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নয়পালের সৈন্যবাহিনীর ওপর। কিন্তু নয়পাল আগে থেকে সতর্ক থাকায় লক্ষ্মীকর্ণ

BanglaBook.org

কুলিয়ে উঠতে পারল না। প্রাণ বাঁচানোর কৌশল হিসেবে সে গিয়ে উঠল বিক্রমশীলা মহাবিহারে।

এদিকে বিক্রমশীলা বিহারের বাইরে লক্ষ্মীকর্ণকে ধরার জন্য ওত পেতে বসে আছেন নয়পাল তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে।

অতীশ দীপঙ্কর দেখলেন একদল সৈন্য বিহার তোরণ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করছে। তাদের হাতে নানা ধরনের অস্ত্র চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। দীপঙ্কর এ বিপদ দেখে তার ছাদের চিলেকোঠা থেকে নিচে নেমে এলেন।

এমন সময় বিহারের কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলে উঠল। দীপঙ্কর যে লোকটির কাছ এগিয়ে গেলেন বুঝতে পারলেন সেই হচ্ছে এ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। দীপঙ্কর দৃঢ়কণ্ঠে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা কে? কি জন্য রাতের অন্ধকারে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ পবিত্র বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করেছ? সাবধান, এ বিহারকে অপবিত্র করো না।' এর মধ্যেই বিহারের ছাত্র-শিক্ষকেরা এসে দীপঙ্করের পাশে জড়ো হল। এর মাঝে তিব্বত থেকে আসা লোকগুলোও এলেন।

দলপতি বলে উঠল, 'তুমি কে?' পাশ থেকে একজন উত্তর দিল, ইনি এই বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

লক্ষ্মীকর্ণ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম শুনে অনেকটা সংযত হয়ে পড়ল। বলল, 'আপনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, আপনাকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করছি। আমার জীবন আজ ধন্য।'

দীপঙ্কর বুঝতে পারলেন, এ মুহূর্তে তার এ বিনয় সবটাই কূটকৌশল মাত্র। তাই তিনি লক্ষ্মীকর্ণকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ, আপনি কেন নয়পালের উপর ক্ষেপে আছেন, কেন এদেশের উপর বার বার আক্রমণ করছেন?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলল, 'না না, আমি কেন নয়পালের উপর আক্রমণ করতে যাব। শিকারে বের হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে খাদ্য ফুরিয়ে গেছে, ভাবলাম বিহারে প্রবেশ করে কিছু খাদ্য ভিক্ষা করে নেব।' দীপঙ্কর বললেন, 'মহারাজ, বিহার তোরণ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা কি আপনার ভিক্ষার নীতি?'

এরমধ্যে খবর এল লক্ষ্মীকর্ণের লোকেরা খাদ্যগুদাম ভেঙে খাদ্য-শস্য লুট করতে শুরু করেছে। দীপঙ্কর নিরুপায় হয়ে লক্ষ্মীকর্ণকে অনুরোধ

BanglaBook.org

করলেন বিহারভূমি ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য। লক্ষ্মীকর্ণ বলল, 'অসম্ভব! আমাদের রাতের আশ্রয় ও খাদ্যের প্রয়োজন। আমরা কিছুতেই এ স্থান ত্যাগ করতে পারি না।' তারপর বিনীতভাবে বলল, 'আপনি বরং যান, গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

তিব্বতিরা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তারা এবার দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কাছে গিয়ে কানে কানে বললেন, 'মহাচার্য, আপনি যদি আদেশ দেন, তবে আমরা এদেরকে বিহার থেকে তাড়াতে পারি।'

দীপঙ্কর বললেন, 'তোমরা মাত্র দশ জন লোক এদের সাথে কীভাবে পেরে উঠবে?'

'আপনি আদেশ দিয়ে দেখুন আমরা কী করতে পারি।'

'তবে চেষ্টা করে দেখুন। আমি চাই না শত্রুরা এ পবিত্র বিহারভূমির মাটি অপবিত্র করুক।'

দীপঙ্কর তাঁর লোকদের নিয়ে লক্ষ্মীকর্ণের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। মুহূর্তেই দ্রুম-দ্রাম শব্দে চারিদিক ফেটে পড়ল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ল আকাশে। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল বিহার চত্বর। শত্রুরা ভয়ে-ত্রাসে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের চোখ ধোঁয়ায় অন্ধকার। লক্ষ্মীকর্ণ এই অন্ধকারের মধ্যেই কোনোমতে প্রাচীর টপকে পালাবার চেষ্টা করল। সাথে সাথে তার সামনে দ্রুম করে আরেকটা শব্দ হল। লক্ষ্মীকর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল বিহার চত্বরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুম-দ্রাম শব্দ বন্ধ হল। জ্ঞান ফিরে আসার পর লক্ষ্মীকর্ণ বলল, 'বাবা গো, মা গো ভূত! প্রেত! পিশাচ! বাঁচাও বাঁচাও!'

আচার্য বিনয় ধর লক্ষ্মীকর্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মীকর্ণ দ্রুম-দ্রাম শব্দ হওয়ার সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ছায়ায় এক নজর দেখতে পেয়েছিল বিনয় ধরকে। বিনয় ধরকে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, 'পিশাচ! দীপঙ্করের পোষা পিশাচ! আমাকে রক্ষা করো!'

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বললেন. 'আপনি না চেদি রাজ্যের রাজা। এমন শিশুর মতো চিৎকার কি মহারাজকে মানায়?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলল, 'আমি কোনো রাজা বা বীরকে ভয় পাই না। কিন্তু আপনার

BanglaBook.org

পিশাচের কাণ্ড দেখে সত্যি ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে। দয়া করে পিশাচটাকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিন, নইলে ও আবার অগ্নিবাণ ছুঁড়ে মারবে।'

আমাদের দেশে এটাই ছিল বিস্ফোরক দ্রব্য বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রথম ঘটনা। কাজেই এই আশ্চর্য জিনিসটিকে লক্ষ্মীকর্ণের কাছে ভূত পিশাচের কাণ্ড বলেই মনে হয়েছিল। এ ঘটনাটি ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সংঘটিত হয়েছিল বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

মৈত্রী স্থাপন

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শুধু একজন ধর্মতত্ত্ববিদ বা বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিতই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদও।

দীপঙ্কর ভাবলেন, যেভাবে লক্ষ্মীকর্ণ ও নয়পালের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বেড়ে চলেছে তা রোধ করতে হবে অন্য পথে। তাই তিনি লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী ও নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। পিতা মহীপাল যেমন দীপঙ্করকে শ্রদ্ধা করতেন তেমনি নয়পাল তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা করেন। বিগ্রহপাল পিতার খুবই অনুগত। কাজেই দীপঙ্করের প্রতি তারও শ্রদ্ধার অন্ত নেই।

এদিকে লক্ষ্মীকর্ণও বুঝতে পেরেছেন দীপঙ্করের অবাধ্য হলে তাঁর আর শেষ রক্ষা নেই। তাই দীপঙ্কর যখন দুই রাজার কাছে তাদের পুত্র ও কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই মহাজ্ঞানীর সম্মান রক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে গেলেন। মহা ধুমধামের সাথে দু' শত্রুরাজ্যের সাথে মিত্রতা স্থাপিত হল। বিয়ের অনুষ্ঠানেই দুই রাজার মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। একজন কোনোদিন অন্যজনকে আর আক্রমণ করবেন না।

ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' উপন্যাসে এ কাহিনীটি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে দীপঙ্করের এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

BanglaBook.org

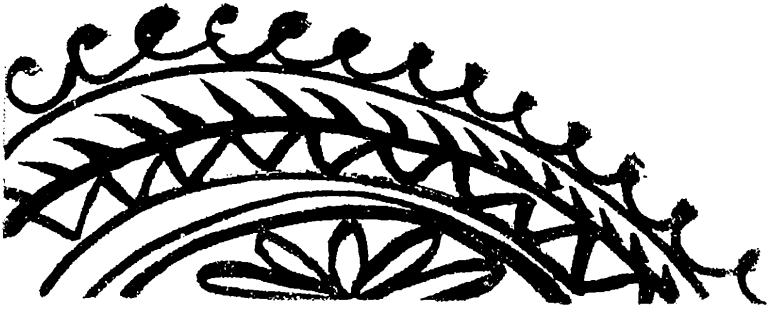

অগ্নিগোলকের সন্ধানে

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একদিন তিব্বতিদের সাথে করে আনা মহাশক্তিধর বস্তুগুলো হাতে নিয়ে দেখছিলেন। বিনয় ধর বললেন, 'এর নাম অগ্নিগোলক। এগুলো আবিষ্কার করেছেন চীনা বৈজ্ঞানিকেরা।'

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জিনিসগুলো খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলেন, 'এ তো দেখছি পোড়ামাটির তৈরি!'

'হ্যাঁ মহাচার্য, পোড়ামাটির এই গোলাকার বস্তুটিই এত শক্তিশালী। এর ভেতরে আছে কিছু ছাইয়ের মতো বস্তু। মাটি বা কোনো শক্ত বস্তুতে আঘাত করলে এটি বিস্ফোরিত হয়। সেদিন রাতে যে বিকট শব্দ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল সেটা এ বস্তুটারই বিস্ফোরণের শব্দ। শুধু শব্দই নয়, এর ভেতরে লৌহ বা কাচখণ্ড ভরে দিলে এটি হয়ে ওঠে আরো ভয়াবহ। নিমেষেই এক মহা তাণ্ডব বইয়ে দিতে পারে। মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ার মেরে নিমেষেই শেষ করে দিতে পারে।'

'তাহলে তো আমাদের দেশের শত্রু, দুর্বৃত্তদের তাড়াতে এ অগ্নিগোলক নামের বস্তুটি ভীষণ কাজে আসতে পারে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটি তৈরির কৌশল জানো?'

আচার্য বিনয় ধর বললেন, 'না মহাচার্য, আমরা কেউ এ গোপনবিদ্যা সম্বন্ধে জানি না। তা ছাড়া এ জ্ঞান আয়ত্ত করার মতো ক্ষমতাও আমাদের কারো নেই।'

BanglaBook.org

'আমরা যদি তোমাদের দেশে লোক পাঠিয়ে এ জ্ঞান আয়ত্ত করে আনতে চাই। তোমাদের রাজা কি তাতে রাজি হবে?'

'মহাচার্য, আপনি চাইলে আমাদের রাজা যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কাজটি তারও নাগালের বাইরে। তিনি একজন চীনদেশী বৈজ্ঞানিক এনে এগুলো তৈরি করিয়েছেন। সে বৈজ্ঞানিক যার-তার কাছে এ জ্ঞান বিতরণ করবেন না। এ জ্ঞান যদি অপাত্রে যায় তবে পৃথিবীর সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। তাই চীন সম্রাটের কড়া নির্দেশ, বাইরের কারো কাছে এ জ্ঞান হস্তান্তর করা যাবে না।'

'আচ্ছা বিনয় ধর, যদি আমাদের মহারাজ নয়পাল চীনা বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ জানান তবে কি তিনি আসবেন?'

বিনয় ধর বললেন, 'না, তা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের মহারাজ অতিকষ্টে বৈজ্ঞানিককে দেশে এনেছেন। তাকে দেশের বাইরে পাঠাতে হলে চীন সম্রাটের অনুমতি লাগবে। তা ছাড়া তারও বয়স হয়েছে। হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পার হয়ে তার পক্ষে এ দেশে আসা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য বিনয় ধরকে বললেন, 'পাল রাজত্ব আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। পালেরা এ দেশের ক্ষমতা হারালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার কারা করবে? আমাদের এ জাতীয় সঙ্কটে চৈনিক বৈজ্ঞানিক কি সাহায্য করবেন না?'

এ সঙ্কটের কথা বললে তিনি সাহায্য করবেন অবশ্যই, তবে অপাত্রে নয়। যোগ্য লোক ছাড়া এ গুপ্তবিদ্যা তিনি কাউকে শিক্ষা দেবেন না।'

'তোমার ইচ্ছেই পূরণ হল। বিনয় ধর প্রস্তুত হও। আমিই যাব তিব্বতে।'

এরপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অগ্নিগোলকটি খুব সাবধানে বিনয় ধরের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'নিজের জীবনের চেয়ে দেশ অনেক বড়। এ দেশের সম্মান রক্ষার জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত।'

আচার্য রত্নাকর বললেন, 'অতীশ! তুমি চলে গেলে যে এ বিক্রমশীলা মহাবিহার নিঃস্ব হয়ে যাবে!'

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বললেন, 'আমাকে তিব্বতে যেতেই হবে। এ বিদ্যা শিক্ষা করতে না পারলে এ দেশ ও দেশের ধর্মকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। আমি এ বিদ্যা আয়ত্ত করে অচিরেই আবার ফিরে আসব। আপনারা আমার যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কালই আমি বিক্রমশীলা মহাবিহারের দায়িত্ব আপনার কাছে বুঝিয়ে দিতে চাই।'

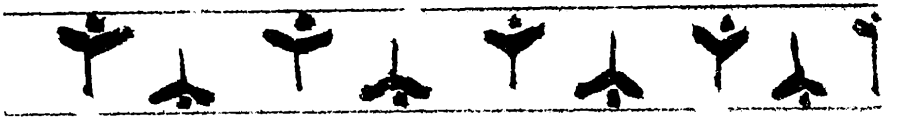

BanglaBook.org

তিব্বতের পথে যাত্রা

১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দোভাষী হিসেবে সঙ্গে নিলেন তিব্বত থেকে পড়তে আসা বিক্রমশীলা বিহারেরই এক ছাত্র লোচবাকে। আরো কয়েক জন ভক্ত সঙ্গী হলেন তার। যাত্রার কয়েক দিন আগে তার পাঠের মতো প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি লোক মারফত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দীপঙ্কর তার সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে কয়েক দিনের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলেন বৌদ্ধগয়ায়। এখানেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব লাভ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ডাকনাম কুমার সিদ্ধার্থ। তিনিও ছিলেন এক রাজপুত্র। সংসারের মায়া ত্যাগ করে বেছে নিয়েছিলেন সাধনার পথ। পরে এখানে বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় লাভ করেছিলেন বোধিসত্ত্ব।

দীপঙ্করও এক রাজার পুত্র। বিলাসবহুল জীবনের মায়া ত্যাগ করে জ্ঞান অন্বেষণের পথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। ভিক্ষু বেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ-দেশান্তরে। আজ তিনি মানুষের মনে আসন করে নিয়েছেন অতীশ বা মহামানব বলে। তাই বলে মানবজীবনে জ্ঞান অন্বেষণের শেষ নেই। জ্ঞানকে অর্জন করতে হয় কঠিন সাধনাবলে। জ্ঞানের জন্য মানুষকে হতে হয় ধ্যানী। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কিছু দিন বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করলেন বজ্রাসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। তারপর সবগুলো তীর্থস্থান দর্শন করে তিনি নেপালের পথে যাত্রা করলেন। বুদ্ধগয়ার পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভসহ আরো উনিশ জন ভিক্ষু তার সঙ্গী হলেন।

BanglaBook.org

এরপর এসে তারা উপস্থিত হলেন নেপাল ও ভারতের সীমান্তবর্তী এক বিহারে। কিছু দিন সেখানে থেকে এলেন কপিলাবস্তুর অদূরে লুম্বিনী কাননে। গৌতম বুদ্ধের পবিত্র জন্মস্থান এই লুম্বিনী কানন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এ পবিত্র স্থানের মাটি ছুঁয়ে প্রণাম জানালেন লুম্বিনীর শ্রেষ্ঠ সন্তান গৌতম বুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এখানেও কিছু দিন কাটালেন।

দীপঙ্কর লুম্বিনী কাননে অবস্থান করছেন এ সংবাদ পেয়ে নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি দূত পাঠালেন লুম্বিনী কাননে তাঁকে নেপাল রাজের আতিথ্য গ্রহণের জন্য। অনন্তকীর্তি দীপঙ্করের জন্য রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। এখানে অবস্থানকালে দীপঙ্কর অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভকে দীক্ষা দিলেন। ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তার নাম হল ভিক্ষু দেবেন্দ্র। ভিক্ষু দেবেন্দ্রও চাইলেন তার গুরুর সাথে তিব্বত যেতে। কিন্তু দীপঙ্কর তাকে বারণ করলেন। বললেন, 'স্বদেশই তোমার ভিক্ষুজীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান।'

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নেপালে অবস্থান করেছিলেন যেখানে, সে পরম সৌভাগ্যের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য অনন্তকীর্তি সেখানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এর নাম 'থানবিহার'। রাজধানী থেকে রওনা হয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চল গ্যাছন ও ডাবুস নামক স্থানেও কিছু দিন তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে অবস্থান করেন। যেখানে যান তিনি সেখানেই গড়ে ওঠে ধর্মচর্চাকেন্দ্র। তার স্মৃতি রক্ষার্থে এখানেও একটি বিহার তৈরি করা হয়। এর নাম 'লা-খান ডকরুপো' বিহার।

স্বদেশের মায়া

সামনেই গিরিরাজ হিমালয়। এরই পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে বহুদূর। কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এক দিকে ছোট বড় পাথরের স্তূপ। চড়াই-উৎরাই পথ। পদে পদে বিষাক্ত সাপ, হিংস্র হায়েনা ও নানা সরীসৃপের ভয়। তার উপর দারুণ শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাত-এ সবকিছুই অতিক্রম করে যেতে হবে তিব্বতে।

এ সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বয়স হয়েছিল ষাট বছরেরও কিছু বেশি। এ বৃদ্ধ বয়সে একবার কোনোক্রমে যদি তিব্বত পৌঁছান যায়, তাঁর পক্ষে যে আর স্বদেশে ফিরে আসা সম্ভব হবে না, এ কথা শ্রীজ্ঞান মর্মে মর্মে অনুভব

BanglaBook.org

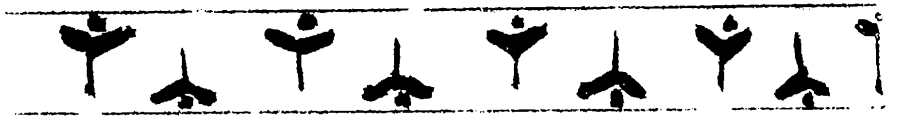

করতে পারলেন। একটু পরেই ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে শ্রীজ্ঞান পা বাড়ালেন তিব্বত ভূখণ্ডে। দেশের জন্য বার বার তার মন কেঁদে উঠল। তিনি পিছন ফিরে যতবার স্বদেশের মুখ দেখেন ততবারই তার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আবেগে।

যে দেশের মাটি তাঁকে জন্মের পর থেকে মায়ের মতো লালন করেছে, সে মাটির মমতা ছেড়ে তিনি চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে গভীর আবেগে চুম্বন করলেন। হাতের ধুলোকণাগুলো পরম মমতায় চোখে-মুখে মেখে দিলেন।

এমন সময় দেখতে পেলেন দু'টি কুকুরছানা ভারত ও তিব্বত সীমান্ত রেখার কাছে আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। মাতৃভূমির শেষ স্মৃতি। পরম আদরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কুকুরছানা দুটোকে তুলে নিলেন তাঁর গেরুয়া বস্ত্রের আঁচলে। বললেন, 'আমি যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন তোমরা থাকবে আমার চোখের মণি হয়ে, স্বদেশের শেষ স্মৃতি হিসেবে।'

প্রায় সব ধর্মেই কুকুর একটি নিকৃষ্ট প্রাণী। দীপঙ্করের এ আচরণ দেখে তার সহযাত্রীদেরও অনেকেই তা পছন্দ করেন নি। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই আপত্তি করলেন, 'মহাচার্য, কুকুর একটি অপবিত্র প্রাণী। প্রার্থনার জন্য যে পবিত্রতার প্রয়োজন, কুকুরছানা দু'টি তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।'

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বললেন, 'এ কুকুরছানা দুটোই আমার মাতৃভূমির শেষ স্মৃতি। হয়তো আমি আর দেশে ফিরতে পারব না। এ কুকুরছানা দুটিই স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমার জন্মভূমির স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়ে রাখবে।'

এটি কোনো অতিরঞ্জক কথা নয়। তিব্বতি ভাষায় লেখা 'ডোম-তান'-এর 'গুরু গুরু ধর্মকর' গ্রন্থে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

পথের অনেক বাধা অতিক্রম করে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের 'হোলকা' নামক বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। এ বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন দীপঙ্করের বাল্যজীবনের এক সহপাঠী। ভারতের কোনো এক বিহারে দু'জন একসাথে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন। বয়সের কারণে চোখে দেখতে পান না। তাই তিনি সবার কাছে 'বধির স্থবিরাচার্য' বলে পরিচিত। দীপঙ্কর তার বন্ধুর অনুরোধে 'হোলকা' বিহারে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 'আর্য সঙ্গ প্রদীপ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

BanglaBook.org

বাংলা থেকে দীপঙ্কর যাত্রা করেছেন এর মধ্যে এক বছর কেটে গেছে। এবার তিনি এসে উপস্থিত হলেন 'থুং' নামক বিহারে। তাঁর এক তিব্বতি দোভাষী ভিক্ষু বিক্রমসিংহ এখানে এসে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এজন্য থুং বিহারে অনেক দিন অবস্থান করতে হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে। অনেক চিকিৎসা ও সেবাযত্নের পরও বিক্রমসিংহকে বাঁচানো সম্ভব হল না। দোভাষীর মৃত্যুতে দীপঙ্করের মন ভেঙে গেল। তিনি বললেন, বিক্রমসিংহের অভাবে আমার তিব্বতযাত্রা বিফল। তাঁর মতো একজন দক্ষ ভাষাজ্ঞানীর অভাবে আমি সে দেশে গিয়ে কীভাবে কাজ করব? বিক্রমসিংহ ছাড়াও দীপঙ্করের আরো দু'জন দোভাষী ছিলেন। তার মধ্যে 'শীল বিজয়' অন্যতম। শেষ পর্যন্ত দীপঙ্কর এদের উপর ভরসা করেই রাজধানীর পথে পা বাড়ালেন।

রাজকীয় সংবর্ধনা

থুং বিহার থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যাত্রা করলেন তিব্বতের রাজধানী থোলিনের পথে। তাঁকে পার হয়ে যেতে হবে প্রাদেশিক রাজধানী 'শিগৎ সে'। সেখানে তাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ইতোপূর্বেই 'মথো উডিন' নামে একটি বিহার নির্মাণ করা হয়েছে। রাজধানীতে যাওয়ার পথে তাঁকে এখানে জানানো হল প্রাণঢালা সংবর্ধনা।

রাজধানী থোলিনে আয়োজন করা হয়েছে তিব্বতের ইতিহাসের সবচে' বর্ণাঢ্য সংবর্ধনার। সংবর্ধনা জানানোর জন্য রাজা চংছুপ সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিব্বতের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এরূপ সংবর্ধনা কোনোদিন কোনো রাজা বা সম্রাটকেও দেওয়া হয় নি তিব্বতের মাটিতে।

রাজধানীতে প্রবেশ করার পথে তাঁকে জানানো হয় দ্বিতীয় সংবর্ধনা। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় তিব্বতের 'গু-জে' নামক স্থানে। এ স্থানটি আজো তিব্বতিদের কাছে একটি পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য। এ সংবর্ধনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে

'এক শত অশ্বারোহী চারটি দলে বিভক্ত। প্রত্যেকের পরনেই শ্বেতবস্ত্র। প্রতিটি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন করে সেনাধ্যক্ষ। অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

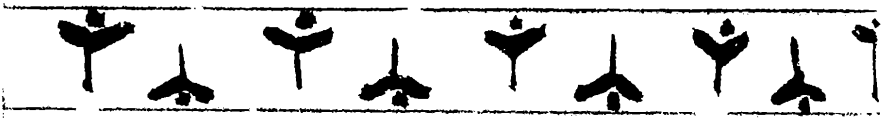

আছে পতাকাবাহী দল। প্রত্যেকের হাতে ১৬টি করে বর্শা। প্রতিটি বর্শার উপরে রয়েছে একটি করে শ্বেতপতাকা। অশ্বারোহীদের হাতেও রয়েছে শ্বেতপতাকা। চারটি দলেই আছে ২০টি করে সার্টিনের ছত্র। চারদিক পরিবেষ্টিত করে আছে বাদক ও সঙ্গীত দল। সেনাধ্যক্ষগণ রাজা চংছুপের নামে অতীশকে প্রণতি করে অভিনন্দন করার সাথে সাথেই সঙ্গীত ও বাদ্যের সুরলহরীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।'

গু-জে নামক স্থান থেকে অভ্যর্থনাকারী দল অতীশকে নিয়ে রওয়ানা হল রাজধানীতে। সেখানে রাজা চংছুপ অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জগৎবিখ্যাত জ্ঞানীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করার জন্য।

রাজধানীতে বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছেন অগণিত জনতা। মহারাজ চংছুপের নির্দেশে জনতার সামনে অতীশকে অভিনন্দিত করা হল আবেগ আপ্লুত ভাষায়

হে মহাপুরুষ!

অন্তর্যামী যেমন ভক্তের প্রার্থনা শুনে ভক্তের মনের বাসনা পূর্ণ করেন, তেমনি আপনি তিব্বতবাসীর অনুরোধে দয়া করে তিব্বতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনি জ্ঞানী, আপনি পরশমণি, যার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়, তেমনি আপনার স্পর্শসুধা পান করে তিব্বতের মাটি সোনা হয়ে উঠবে, মানুষের অন্তর্লোক আলোকিত হবে আপনার জ্ঞানের প্রভায়।

অভিনন্দনে আরো বলা হল

হে তাপস!

আপনার দেশের মতো আমাদের দেশে ষড়ঋতুর পালাবদল নেই। কিন্তু এখানে আছে নৈসর্গিক শোভা, শত শত ঝর্না, আছে সুবিশাল হ্রদ। শীতকালে এ দেশের শৈত্যপ্রবাহে মানুষের কোনো কষ্ট হয় না। শীতে যখন হিমালয়ের চূড়া বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন সমভূমি থাকে উষ্ণ। বসন্তকালে এ দেশে খাদ্যের অভাব হয় না, এখানে বছরে পাঁচ বার ফল উৎপন্ন হয়। শরৎকালে তৃণলতার, নবপল্লবে পোরাদেশ সুশ্যামল হয়ে ওঠে। আমাদের এই পবিত্র জন্মভূমি আপনার পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে।

BanglaBook.org

এরপর মহারাজ যেশেওর অন্তিম ইচ্ছে থেকে শুরু করে তিব্বতের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে এ দেশে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অতীশকে আহ্বান করা হল। অভিনন্দনবাণী পাঠের পর মহিমাসঙ্গীত গেয়ে অতীশকে বরণ করা হল রাজঅতিথি হিসেবে।

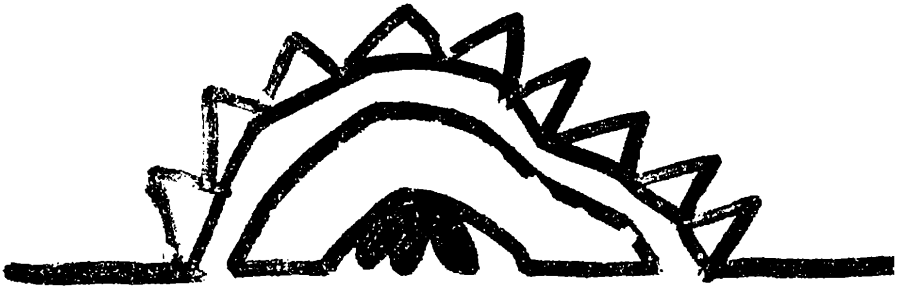

চা দিয়ে আপ্যায়ন

রাজধানীতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে প্রথমে আপ্যায়িত করা হল এক গ্লাস গরম পানীয় দিয়ে। দীপঙ্করের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এ পানীয়। রঙ দেখে ভাবলেন, হয়তো তাকে সুরা দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। ভিক্ষুদের জন্য সুরা পান নিষিদ্ধ। তাই দীপঙ্কর গ্লাসটি স্পর্শ করলেন না। নানা দেশের নানা আচার। শীতের দেশ বলে হয়তো এ দেশে জিনিসটি নিষিদ্ধ নাও হতে পারে। তাই তিনি মুখ ফুটে না-ও বলতে পারছেন না। মহারাজ চংছুপ স্বয়ং বললেন, 'মহাত্মন, আপনি আমাদের দেশের এই অমৃত পানীয় পান করে আমাদের কৃতার্থ করুন।'

এবার অতীশ বললেন, 'তোমরা যে এর এত সুখ্যাতি করছ এর নাম কি?' রাজা চংছুপ বললেন, 'এর নাম চা। এ এক জীবন সঞ্জীবনী পানীয়। এ গাছের ছাল খেতে নেই। এর পাতা শুকিয়ে গরম পানিতে সিদ্ধ করে শুধু পানিটুকু পান করতে হয়।'

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবার নিঃসঙ্কোচে গ্লাসটি মুখে তুলে চায়ে চুমুক দিলেন।

BanglaBook.org

এক অপূর্ব পুলকে তার সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠল। যেন নিমেষেই তিনি পথের সব ক্লান্তি ভুলে গেলেন। বললেন, 'সত্যি এ এক দুর্লভ পানীয়।'

মহারাজ চংছুপ বললেন, 'আমরা চা গাছকে জীবনবৃক্ষ বলে মনে করে থাকি।' এই বলে তিনি চা সম্বন্ধে সারা চীন জুড়ে যে উপ-কাহিনী প্রচলিত আছে তা শুনালেন। চা-এর উপ-কাহিনীটি হচ্ছে এরূপ

চীনের কোনো এক সম্রাটের এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছিল। সম্রাট তাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। একবার সে বায়না ধরল তাকে পদ্মফুল এনে দিতে হবে। সে অন্য কারো সংগ্রহ করা পদ্ম নেবে না। পদ্ম ফুলটি সংগ্রহ করে আনতে হবে স্বয়ং সম্রাটকে।

সম্রাট পড়লেন মহাচিন্তায়, রাজ্যের এত কাজ ফেলে তিনি কিনা যাবেন বাচ্চাদের মতো পদ্মফুল সংগ্রহ করতে। কিন্তু মেয়ের একই বায়না। বাবার হাতে সংগ্রহ করা পদ্ম ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সংগ্রহ করা পদ্ম সে গ্রহণ করবে না।

শেষে মেয়েকে খুশি করার জন্য সম্রাট নিজেই পথে বের হলেন পদ্মফুল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। নানা দেশ ঘুরে, নানা বিল-পুকুর খুঁজে অবশেষে একটি পদ্ম নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন প্রাসাদে। কিন্তু এরই মধ্যে পদ্মের জন্য অপেক্ষা করতে করতে না খেয়ে না খেয়ে সম্রাটের আদরের সে মেয়েটি মরে গেল।

সম্রাট হঠাৎ এ দুঃসংবাদ শুনে যেন পাথর হয়ে গেলেন। পদ্মফুলটি হাতে নিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পাথরের মতো একটানা তিন দিন তিন রাত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আস্তে আস্তে তারও মূর্ছাভাব কাটল। তিনি বললেন, 'আমি ও পদ্মফুলটি আমার মেয়ের হাতে দিতে চাই। এমন কি কোনো ঔষধ আছে যে আমার মেয়েকে শুধু এক মুহূর্তের জন্য জীবন দিতে পারবে? আমার কাছ থেকে হাসিমুখে পদ্মফুলটি নেয়ার পর মেয়ে যদি আর বেঁচে নাও ওঠে তাতে আর কোনো দুঃখ থাকবে না।' সম্রাটের মুখে দিনরাত শুধু একই কথা।

সম্রাটের কষ্ট দেখে সৃষ্টিকর্তা আকাশ থেকে এক দূতকে পাঠালেন একটি জীবনবৃক্ষ দিয়ে। স্বর্গীয় দূত এসে প্রাসাদের বাইরে সেই বৃক্ষটি

BanglaBook.org

সযত্নে মাটিতে পুঁতে দিলেন। তারপর তিনি সম্রাটের কাছে এসে বললেন, মানবজীবনে মৃত্যু এক অনিবার্য পরিণতি। এ থেকে কারো মুক্তি নেই। আপনার কন্যা যে পথে গেছে সেখান থেকে তার আর ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মানুষের ভালোবাসার কাছে মৃত্যুও তুচ্ছ। আপনি পদ্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন শুধু একটি অবুঝ কন্যাকে খুশি করার জন্য, এতে আপনার প্রতি স্রষ্টা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাকে পাঠানো হয়েছে শুধু পদ্মফুলটি আপনার মেয়ের হাতে তুলে দেয়ার একটি মুহূর্তের জন্য। আপনার মৃতকন্যা জীবন পাবে শুধু ক্ষণিকের জন্য। আপনার হাত থেকে খুশি মনে ফুলটি নিয়ে সে আবার ফিরে যাবে তার শেষ পরিণতির কাছে।' সম্রাট বললেন, 'তবু আমি মেয়েকে এ ফুলটি দিতে চাই, তাকে এক মুহূর্ত খুশি দেখতে চাই।'

এরপর স্বর্গদূত বললেন, 'এক পাত্র গরম পানি আনুন'। সম্রাট নিজ হাতে পানি নিয়ে এলেন। স্বর্গদূত প্রাসাদের বাইরে সদ্য লাগানো গাছটি থেকে কতগুলো মরাপাতা এনে হাতে কচলিয়ে পাত্রটিতে দিলেন। পাত্রের পানি নিমেষে লাল হয়ে গেল। এরপর গাছের দু'টি কচি পাতা ছিঁড়ে এনে সম্রাটের মৃতকন্যার চোখের পাতায় লাগিয়ে দিলেন। মেয়েটি আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু তার দেহে প্রাণ ফিরে আসে নি। এবার স্বর্গদূত পাত্র থেকে গরম লাল পানীয়টুকু একটা গ্লাসে করে মেয়েটির মুখে ঢেলে দিলেন। নিমেষেই মেয়েটি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

পিতার হাতে পদ্ম দেখে মেয়েটি খুব খুশি হল। হাসিমুখে পদ্মটি হাতে নিয়ে বাবার মুখে একটি চুমু এঁকে দিয়ে আবার সে চলে গেল মৃত্যুর কোলে। এই সেই জীবনদায়ী বৃক্ষের পানীয় চা। মেয়ের ঘুম ভাঙিয়েছিল যে দু'টি কচি পাতা। চা গাছের সে কচিপাতা থেকেই তৈরি হয় উৎকৃষ্ট চা। যে পান করে সে যেন মুহূর্তের জন্য নবজন্ম লাভ করে।

অতীশ দীপঙ্কর রাজা চংছুপের মুখে এ উপকথাটি শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'সত্যি চায়ে শরীর-মন সজীব করার মতো গুণ আছে।'

চীন দেশের এ পানীয়টি সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। বাঙালিদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্করই প্রথম চা পান করেছিলেন বলে জানা যায়।

BanglaBook.org

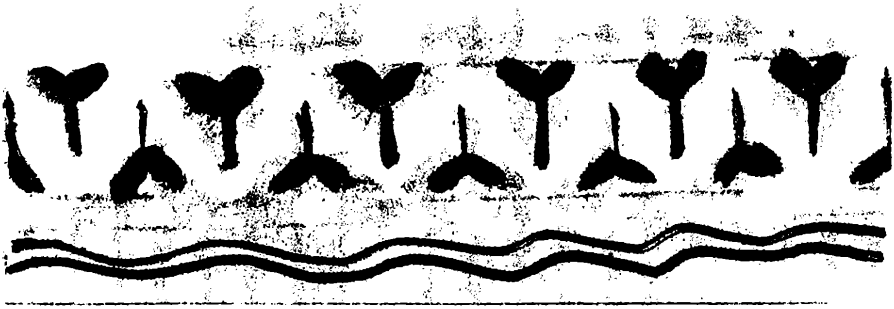

জ্ঞানের সাধক

১০৪২ খ্রিস্টাব্দে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের রাজধানীতে এসে পৌঁছেন। তখন তাঁর বয়স ৬১ বছর। এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ছিলেন যুবকের মতো কর্মক্ষম। তিব্বতজীবনের দিনগুলো তিনি বিহার থেকে বিহারে ছুটে বেরিয়েছেন। মানুষকে দীক্ষা দিয়েছেন গৌতম বুদ্ধের অহিংসার শিক্ষায়। শুধু পাণ্ডিত্যেই তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মীও। তাঁর প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে দেশের মানুষ আবার তাদের হারানো ধর্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

দীপঙ্কর জানতেন তিনি সারাজীবন যে জ্ঞানের সাধন করেছেন সে জ্ঞান যাতে চিরদিন মানুষের কল্যাণে আসে সেরকম কাজ করতে হবে। এ জন্য মন দিলেন গ্রন্থ রচনায়। গ্রন্থের জ্ঞান স্থায়ী। তা কাল থেকে কালে বয়ে চলে, এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের কাছে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে। আর এ জন্যই তিব্বতে অবস্থানকালে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি গ্রন্থ রচনার মতো কঠিন সাধনায় রত হলেন।

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত আসার পর বেঁচে ছিলেন মাত্র তের বছর। এ অল্প সময়ের মধ্যেই ১০৮টি মহা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ৩৫টি আর বৌদ্ধ ধর্মের সাধনতন্ত্র বিষয়ে রচনা করেন ৭৩টি গ্রন্থ। তিব্বতে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো মোট ১৭৫টি খণ্ডে সঙ্কলিত হয়।

BanglaBook.org

এ তথ্যটি জানা যায় ১৯৭৮ সালে পিকিং থেকে প্রকাশিত চীনা বৌদ্ধ সমিতির বই থেকে। বইটিতে উল্লেখ করা হয় যে, তিব্বতে মাত্র ১৩ বছর অবস্থানকালে সারাক্ষণ ধর্মপ্রচার কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি এ অল্প সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, পাণ্ডিত্যের গুণ বিচারেও তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থ জ্ঞানরাজ্যের এক একটি হীরকখণ্ড।

মানবসেবা

অতীশ দীপঙ্কর শুধু ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনাতেই নিজের জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। মানুষের সেবায় তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। যেখানে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখতেন সেখানেই ছুটে যেতেন পরম বন্ধুর মতো।

জীবনে তাঁর সম্পদ ও অর্থের প্রতি কোনো মোহ ছিল না। রাজপুত্র হয়েও তিনি বিলাসবহুল জীবনের মায়া ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছিলেন বিদ্যাশিক্ষার জন্য। তিব্বতের রাজা যেশেওর আন্তরিক উপঢৌকনকেও তিনি অর্থের প্রতি প্রলোভন মনে করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থের মোহ কোনোদিন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।

তিব্বতে অবস্থানকালে ভক্তরা তাঁর নামে বিপুল অর্থ দান করতেন। এসব দানের অর্থ তিনি গরিব নিঃস্বদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

তিব্বতের একটি প্রদেশের নাম 'গংডাকর'। এ প্রদেশের একটি নদীর নাম 'উর-গেছ্যন পো'। বন্যার জন্য চীনের হুয়াংহো নদীকে যেমন 'চীনের দুঃখ' বলে অভিহিত করা হত, তেমনি 'গংডাকর' প্রদেশের দুঃখ নামে পরিচিত ছিল 'উর-গেছ্যন পো' নদী। প্রতি বছর বন্যায় হাজার হাজার ঘরবাড়ি বিনষ্ট হত। মানুষের ক্ষেতের ফসল, রাস্তা-ঘাট সবকিছু ভেসে যেত 'উর-গেছ্যন পো'র বন্যায়। মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য অতীশ দীপঙ্কর 'উপ-গেছ্যন পো' নদীতে বিশাল এক বাঁধ নির্মাণ করেন। না, এ জন্য তিনি দেশের রাজার কাছে কোনো হাত পাতেন নি। জনগণকেও

BanglaBook.org

অনুরোধ করেন নি সাহায্যের জন্য। তাঁর ভাণ্ডারে ভক্তদের দান হিসেবে যে অর্থ ও সম্পদ জমা হত তা দিয়েই তিনি নির্মাণ করেন বিশাল এই বাঁধ। এ বাঁধটি নির্মাণের ফলে গংডাকর প্রদেশের মানুষ খুবই উপকৃত হয়। বন্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় অগণিত মানুষ।

তিব্বতে অতীশ দীপঙ্করের এ দানের কথা আজও লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তারা বাঙালি এক দানবীর অতীশ দীপঙ্করের মহান ত্যাগের কথা।

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন জ্ঞান জগতের সম্রাট। তিনি কোনো রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন না। কিন্তু রাজাদেরও রাজা ছিলেন। তিব্বতে যাওয়ার পর থেকে হাজার বছর ধরে সে দেশের রাজারা তাঁর নামেই রাজ্য শাসন করেছে।

দীপঙ্কর যেদিন তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন থেকে তিনিই ছিলেন মূলত সে দেশের রাজা। তিব্বতের মানুষ যাতে মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্করকে সর্বোচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এ জন্য মহারাজ চংছুপ একটি অনুশাসন জারি করে রাজ্যময় ঘোষণা করেন যে, 'এখন থেকে অতীশ দীপঙ্করই রাজ্যের সর্বময় কর্তা ও প্রভু। তার আদেশ ও উপদেশ যেন কেউ লংঘন না করে।

সে থেকে তিব্বতের সিংহাসনে যত রাজা মহারাজ এসেছেন তারা সবাই রাজ্য শাসন করেছেন অতীশ দীপঙ্করের নামে। রাজা মহারাজারা অভিষেকের সময় এই বলে শপথ গ্রহণ করতেন যে, 'আমি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পক্ষে এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলাম। যতদিন আমার উপর এ দেশের দায়িত্ব থাকবে ততদিন আমি অতীশ দীপঙ্করের নীতি ও আদর্শ মেনে দেশের মানুষের সেবা করব।'

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের একজন সংস্কারক। তিব্বতের মানুষ তখন গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার কথা ভুলে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে নানা তন্ত্র-মন্ত্রে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। দীপঙ্কর অনেক সাধনায় কুশিক্ষার কবল থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে রক্ষা করেন। তাঁর সংস্কারের ফলে বৌদ্ধ ধর্মে একটি নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এদের বলা হয় লামা।

দীপঙ্করের অনুসারীদের লামা বলা হলেও দীপঙ্কর নিজে কখনোই লামা উপাধি গ্রহণ করেন নি। এ লামা সম্প্রদায়ই দীর্ঘকাল তিব্বত ও গণচীন

BanglaBook.org

শাসন করেছে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নামে। শুধু তিব্বতই নয়, তিব্বত ছাড়াও নেপাল, ভুটান, সিকিম ও ভারতের 'লামা'রা আজ নিজেদের অতীশ দীপঙ্করের অনুসারী বলে গর্ববোধ করে।

কথিত আছে, বিশাল চীন সাম্রাজ্যের বলদর্পী সম্রাটগণও অতীশ দীপঙ্করের নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে মাথার মুকুট খুলে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

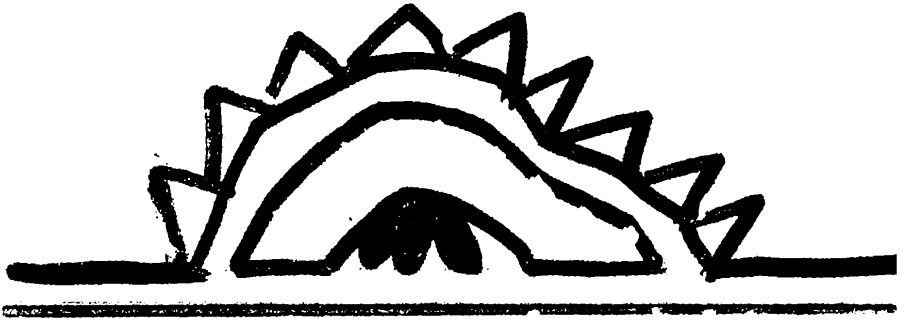

মৃত্যু

মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর ৭৩ বছর বয়সে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের নাথাং বিহারে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে শুধু তিব্বতেই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তিব্বতবাসীও মহাজ্ঞানীকে হারিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এই মহামানবের স্মৃতিকে চির অম্লান রাখার জন্য তাঁর দেহভস্ম সংরক্ষণ করা হয় তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায়। নির্মাণ করা হয় আকাশচুম্বি স্তূপ বা স্মৃতিস্তম্ভ। যেসব জায়গায় তাঁর দেহভস্ম সংরক্ষণ করা হয় সে স্মৃতিস্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নাথাং স্তূপ, রাসগ্রেন স্তূপ ও যাকলুন্স স্তূপ।

এ ছাড়াও তাঁর দেহান্তরের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য তিব্বতে সকুহবুন

BanglaBook.org

ও সাগ্রুলমা নামে দু'টি সুরম্য বিহার নির্মাণ করা হয়। হাজার বছর ধরে অগণিত মানুষ এসব স্তূপ ও বিহার দেখে অতীশ দীপঙ্করকে স্মরণ করেছে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে। শুধু স্তূপ আর বিহারই নয়, অতীশ দীপঙ্কর ১০৮টি বই রচনা করেছিলেন তিব্বতে বসে। সে বইগুলো পরম যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে চলেছে তিব্বতবাসী তাঁদের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে।

দেশের সঙ্কটে জাতির সঙ্কটে যখনই তাদের প্রয়োজন হয়েছে এসব বই থেকে নীতি উপদেশ গ্রহণ করে তারা নতুনভাবে আবার জেগে উঠেছে। বাংলাদেশের মহাজ্ঞানী অতীশের কাছে যেমন তিব্বতবাসী ঋণী, তেমনি এ দেশের মানুষও। কারণ তিনি চীনের সঙ্গে হাজার বছর আগে রচনা করেছিলেন আমাদের মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

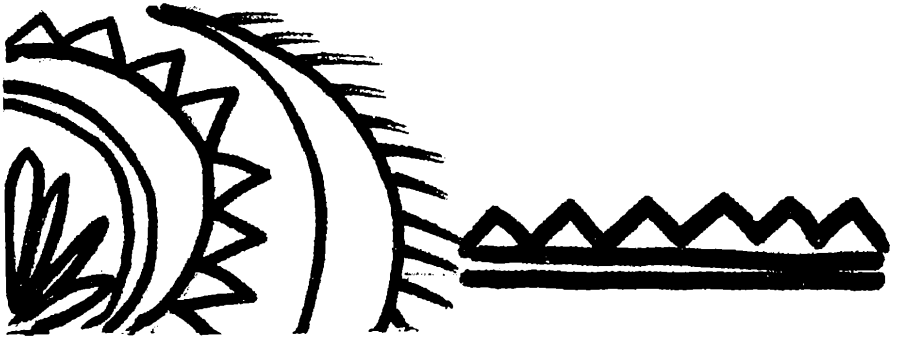

স্বদেশের মাটিতে

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের রাজা চংছুপের অনুরোধে মাত্র তিন বছরের জন্য তিব্বত গিয়েছিলেন। বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য রত্নাকরের কাছে যাওয়ার সময় কথা দিয়েছিলেন তিনি তিন বছরের বেশি তিব্বতে অবস্থান করবেন না। কিন্তু তিন বছরে তিনি সব কাজ শেষ করতে পারেন নি। এ সময় তিব্বতের মানুষ এমনই কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে দীপঙ্করের বাকি জীবনটাই কেটে গেছে। একটানা তের বছর তিব্বতে অবস্থান করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কেউ কেউ

BanglaBook.org

বলেন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁর প্রিয় শিষ্য 'হ্যাবরোন স্টোন'-কে তিব্বতে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে অনেকবারই দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে তাঁর দেশে ফেরা সম্ভব হয় নি।

দীপঙ্কর তিব্বত যাওয়ার অল্পদিনেই মধ্যেই বিশাল পালরাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বঙ্গেও দু'টি আলাদা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বিক্রমপুরে ধর্ম বংশীয়রা এবং কুমিল্লার পট্টিকেরায় দেব বংশের রাজারা এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। বাইরে থেকে চানক্য রাজারাও বার বার এ দেশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সময় বাংলার অনেক অংশই কর্ণাটক থেকে আসা সেনদের দখলে চলে যায়। আস্তে আস্তে সেনবংশ এ দেশের উপর জেঁকে বসে। পালরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। আর সেনরা হচ্ছেন বৈদিক ধর্মাবলম্বী। তারা ক্ষমতা গ্রহণের পর এ দেশের বৌদ্ধদের কাহ্নপা, শাবরীপা, লুইপা, ডোম্বিপা, ভুসুকু আরো অনেক কবি বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন অজস্র ধর্মসঙ্গীত। তাদের রচিত এসব গান আমাদের বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত। কিন্তু বাংলা ভাষা বিকশিত হতে না হতেই এ ভাষার উপর আঘাত এল। সেনরা ঘোষণা করল, ধর্মকথা বলতে হবে দেবভাষায়। সংস্কৃত হচ্ছে দেবভাষা। বাংলা হচ্ছে মানবভাষা। যারা মানবভাষায় ধর্মের কথা বলবে তারা 'রৌরব' নরকে যাবে।

একদিকে মাতৃভাষার উপর অত্যাচার, অন্যদিকে বৌদ্ধদের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলে ঘোষণা করে সেনরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের মানুষের ওপর। এ অবস্থায় যাদের সাধ্য আছে তারা দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিল। কেউ গেল নেপালে, কেউ বার্মায়, কেউ ভুটানে, কেউ বা হিমালয় পাড়ি দিয়ে তিব্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল। অন্যেরা জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে কোনোমতে টিকে থাকল স্বদেশের মাটিতে।

যেখানে দেশের মানুষই প্রাণভরে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে এ গোলযোগের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর কী করে স্বদেশে ফিরে আসবেন? তাই তিব্বত থেকে তাঁর আর দেশে ফেরা হল না।

BanglaBook.org

জীবদ্দশায় না হোক, মৃত্যুর হাজার বছর পরে হলেও দেশের সন্তান আবার দেশে ফিরে এলেন। অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম তিব্বতে হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে চীনা বৌদ্ধ সমিতির সাথে যোগাযোগ করে অতীশ দীপঙ্করের কিছু দেহভস্ম বাংলাদেশে এনে তাঁর জন্মভূমি মুন্সিগঞ্জের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে সংরক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন কমলাপুর। এর পূর্বপাশে বিশ্বরোড নামে পরিচিত রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে 'অতীশ দীপঙ্কর সড়ক'। অথচ দেশের অনেকেই জানেন না কে এই অতীশ দীপঙ্কর। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সন্তান। হাজার বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল ঢাকার অদূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার বজ্রযোগিনী নামক এক গ্রামে।

তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের একজন। তাই মানুষ হয়েও তিনি 'অতীশ' বা মহামানব রূপে পরিচিত হন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলাদেশের গর্বের ধন। মৃত্যুর হাজার বছর পরেও তিনি জ্ঞানজগতে জ্যোতিষ্কের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org